ISSN 2227-1635
বাঙলা সাহিত্যিকী ৫ম সংখ্যা, শ্রাবণ ১৪২৫

বাংলা উপন্যাসে চরাঞ্চলের নারী

*ড. মুহম্মদ আলমগীর

সারসংক্ষেপঃ বাংলার প্রধান অনুষঙ্গ নদী। সংগত কারণে এই অঞ্চলের মানুষের জীবন ধারণের অন্যতম প্রধান উপকরণ নদী। আর বাংলার ভাঙ্গন প্রবণ নদীর প্রধান বাস্তবতা চরাঞ্চল এবং বৃহত্তর বাংলার অধিকাংশ মানুষ কোনো না কোনোভাবে চরাঞ্চলের সঙ্গে যুক্ত। এই অর্থে বাংলার মানুষ মানেই চরাঞ্চলের মানুষ। চরাঞ্চলের মানুষের জীবনে তাদের নারীদের উপস্থিতি ব্যাপক ভূমিকা পালন করে থাকে। এই প্রবন্ধে বাংলা উপন্যাসে প্রতিফলিত চরাঞ্চলের নারীদের বিয়ে, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে নারীদের মতামতের গুরুত্ব ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

ভূমিকা

এই প্রবন্ধে বাংলা বলতে বৃহত্তর বাংলাভাষী অঞ্চলকে বুঝানো হয়েছে। বর্তমান বাংলাদেশ এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরা প্রদেশ নিয়ে এই অঞ্চল বিস্তৃত। এই অঞ্চলের বিস্তৃতি প্রায় আড়াই লক্ষ বর্গকিলোমিটার। নদীমাতৃক বাংলার মানুষের অন্যতম প্রধান অনুষঙ্গ নদী। কাজেই নদী ছাড়া বাংলার মানুষের জীবন অর্থহীন। বাংলা উপন্যাসে এই নদী ও নদীনির্ভর জনজীবনের প্রধা প্রতিফলন ব্যাপকভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। আর এই নদীনির্ভর জনজীবনের প্রধানতম অংশ চরাঞ্চলের সঙ্গে যুক্ত এবং তাদের পারিবারিক জীবনে নারীর ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে। মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্যরত্নের (১৮৬০-১৯২৫) *আনোয়ারা* (১৯১৪), তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৯৮-১৯৭১) *কালিন্দী* (১৯৪০), নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের (১৯১৮-৭০) *উপনিবেশ* [১ম পর্ব (১৯৪২) ও ৩য় পর্ব (১৯৪৬)], রমেশচন্দ্র সেনের (১৮৯৪-১৯৮৬) *কুরপালা* (১৯৪৬), অমরেন্দ্র ঘোষের (১৯০৭-৬২) *চরকাশেম* (১৯৪৯), অদ্বৈত মল্লবর্মণের (১৯১৪-৫১) *তিতাস একটি নদীর নাম* (১৯৫৬), কাজী মাসুমের (১৯২০-?) *ঢেউ জাগে পদ্মায়* (১৯৫৮), আবদুর রশীদ ওয়াসেকপুরীর (১৯২৬-) *বান* (১৯৫৮), সুশীল জানার *বেলাভূমির গান* (১৯৬০), রাবেয়া খাতুনের (১৯৩৫-) *মধুমতী* (১৯৬৩), অনিল বড়ুয়ার *শংখ নদীর তীরে* (১৯৬৭), সত্যেন সেনের (১৯০৭-১৯৮১) *এ কূল ভাঙে ও কূল গড়ে* (১৯৭১), আবুল বাশারের (১৯৫১-) *ভোরের প্রসূতি* (১৯৮১), আবুল খায়ের মুসলেহ্ উদ্দিনের *চর আতরজান* (১৯৮৫), আবু ইসহাকের (১৯২৬-২০০৩) *পদ্মার পলিদ্বীপ* (১৯৮৬), সিরাজুল ইসলাম মুনিরের *পদ্মা উপাখ্যান* (১৯৯৩), ইত্যাদি উপন্যাসে চরাঞ্চলের নারীর দাম্পত্য জীবন, পরিবারের ও সমাজের নারীর অবস্থান ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। বাংলা উপন্যাসের উক্ত প্রেক্ষাপটে স্বাভাবিক ভাবেই অনুসন্ধিৎসু মনে বেশ কিছু প্রশ্নের উদয় হয়। যেমন- বাংলার চরাঞ্চলের বিয়ের প্রকৃতি কেমন? চরের বিধবারা কেমন থাকে? পারিবারিক ও সামাজিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে চরাঞ্চলের নারীর ভূমিকা কী? চরাঞ্চলের নারী প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা পেয়ে থাকে কি? চরের নিগৃহীত নারীর ক্ষেত্রে প্রশাসন ও আইন কতটা সহায়ক? লালসার শিকার নারীদের চরাঞ্চলের মানুষ কীভাবে দেখে? ইত্যাদি। উক্ত বিষয় সম্পর্কে সার্বিক

* সহযোগী অধ্যাপক, নাট্যকলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী

কোনো পর্যালোচনা পরিলক্ষিত হয় না। সংগত কারণে বিষয়টি আলোচনার অপেক্ষা রাখে এবং বাংলা উপন্যাসে যেহেতু বাংলার সমাজমানসের প্রতিফলন অবশ্যম্ভাবী—সেহেতু বাংলা উপন্যাসের নিবিড় পঠন-পাঠন ও যথাযথ বিশ্লেষণের মাধ্যমে উক্ত জিজ্ঞাসাসমূহের জবাব আলোচ্য প্রবন্ধে অনুসন্ধান করা হয়েছে।

দাম্পত্য জীবন

বাংলা উপন্যাসে দেখা যায় চরাঞ্চলে বহুবিবাহ অত্যন্ত প্রকট। অমরেন্দ্র ঘোষের *চরকাশেম* উপন্যাসে ফুলমনের বাবার চার বিয়ে।[১] কাজী মাসুমের *ঢেউ জাগে পদ্মায়* জমির সর্দার তিন বউ বর্তমান থাকা অবস্থায় পছন্দনীয় সোনাভানকে বিয়ে করতে আগ্রহী এবং তালাক দেওয়া স্ত্রীসহ তার মোট স্ত্রীর সংখ্যা প্রায় নয়জন।[২] রাবেয়া খাতুনের *মধুমতী* উপন্যাস হতে জানা যায় চরাঞ্চলে 'সতীন' ছাড়া প্রায় কেউ ঘর করতে পারে না। পরিবারের প্রায় সব পুরুষের একাধিক বউ থাকে—কখনো কখনো তিন চারজন পর্যন্ত।[৩] অনিল বড়ুয়ার *শংখ নদীর তীরে* উপন্যাসের তোরাব ইতোমধ্যে তিন স্ত্রীকে তালাক দিয়েছে। সে আবার বিয়ে করবে এবং তার যা অবস্থা তাতে সে 'একটা কেন—একশটাই' বিয়ে করতে পারে।[৪]

আবুল খায়ের মুসলেহ উদ্দিনের *চর আতরজান* উপন্যাসে বলা হয়েছে চরের মানুষের বহুবিবাহের অন্যতম প্রধান কারণ ধনের প্রাচুর্য। বিশেষ করে চরের ধনী মাতব্বর বংশপরম্পরায় 'সাতটা আটটা দশটা' বিয়ে করে—একটা মরলে আরেকটা বিয়ে করে অথবা একটাকে তালাক দিয়ে আরেকটাকে 'কবুল' করে ঘরে আনে। চরে যারা বউ হয়ে মাতব্বরের ঘরে আসে তারা এটা বুঝেই আসে যে তার স্বামী পূর্বপুরুষদের মতোই বেশ কয়েকটা বিয়ে না করে থামবে না। মাতব্বর বিয়ের প্রথম রাতে সদ্য পরিণীতাকে আদর করতে করতে প্রতিজ্ঞা করে তাকে নিয়েই সে বাকি জীবন পার করে দেবে—বাপ-দাদার মতো পাঁচ সাতটা বিয়ে করবে না। কারণ নববধূর 'মধু' শেষ হবার আগেই সে বুড়ো হয়ে যাবে। কিন্তু মাতব্বর বুড়ো হবার আগেই দেখে তার স্ত্রীর শয্যার 'ডাইনে একটা, বামে একটা, পেটে একটা।' সম্মানী মানুষ মাতব্বরের 'গতর ক্ষেইপা গেলে' সে আর কী করে—সম্মান বাঁচাতে অগত্যা আর একটা বিয়ে করে এবং নাজেহাল স্ত্রীও বাধ্য হয়ে বিয়ের অনুমতি দেয়।[৫] কেবল যৌবনেই নয়—বুড়ো বয়সেও মাতব্বর কচি কুমারী মেয়ে বিয়ে করে। এক শ্রেণির টাউট হেকিম টাকার বিনিময়ে মাতব্বরকে বুড়ো বয়সে ভালো থাকার টনিক বাৎলে দেয়:

> মাতবর সাব, আমার কুদরতি হালুয়ার চাইতেও বেশী উপকারী কচি মাইয়ার লগে সহবত। সব টনিকের বড় টনিক বুড়া মানুষের লাইগা। দেখেন নাই—আগেকার জমানায় রাজা বাদশা, নবাব জমিদারেরা বয়স বাড়লে খালি নাবালগ মাইয়া বিয়া করতো। কচি কচি বান্দী-দাসী রাখতো হেরেম ভর্তি কইরা। যোয়ান নারীর মুখের লালা সব চাইতে বড় সালসা মাতবর সাব। তার চাইতে বড় ওষুধ ইউনানী শাস্ত্রে নাই।[৬]

মোট কথা অর্থ-বিত্ত আর চাটুকারদের কথায় চরের মাতব্বর শ্রেণির রক্তে 'মাইয়া মানুষের নেশা' খেলা করে এবং রক্তের উক্ত খেলা শেষে 'বিয়া রোগে' পরিণত হয়। ফলশ্রুতিতে যে নারীর উপর মাতব্বরের দৃষ্টি পড়ে তাকে ঘরে না এনে সে ছাড়ে না। আর এ ক্ষেত্রে চরের গরিব মানুষ মাতব্বরের হাতে মেয়ে তুলে দিয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। কারণ তার মেয়েতো 'সচ্ছল গেরস্ত'

ঘরে ঠাঁই পেয়েছে।[৭] চরের মাতব্বর টাকার জোরে কেবল যে চরের মেয়ে বিয়ে করে তাই নয়—'টাকার জন্যে' চোর ডাকাত বদনামধারী চরের মাতব্বরের সঙ্গে 'পূব, পশ্চিম, উত্তরের সুন্দরী' মেয়ের বিয়েও অহরহ হয়ে থাকে।[৮]

আবু ইসহাকের *পদ্মার পলিদ্বীপ* উপন্যাসে দেখা যায় এরফান মাতব্বর 'দেশকূলের' মেয়ে হাজেরাকে তার ছেলের বউ করার জন্য 'পানির মতো টাকা খরচ' করেছে—মেয়ের বাবাকে তিনশো একটাকা 'শাচক' এবং মেয়েকে পাঁচ ভরি সোনা দিয়েছে। আর চরেই যদি অবিবাহিত সুন্দরী থাকে তবে 'বিয়ের হাটে রূপসী মেয়ের জন্যে গ্রাহকের ভীড় জমে ...নীলাম ডাকার মত গয়না ও শাচকের টাকার পরিমাণ বাড়িয়ে' রূপসীকে ঘরে আনতে হয়।[৯] 'চর আতরজান' উপন্যাসে দেখা যায় চরের সাধারণ কামলা টাকা ও জমির অভাবে বিয়ে করতে পারে না। কাজেই চরের খেটে খাওয়া মানুষের মধ্যে বহুবিবাহের চল নেই বললেই চলে। যদি কোনো কারণবশত সাধারণ মানুষ দ্বিতীয় বিয়ে করেই ফেলে, তবে সংসারের টানাটানিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রথম স্ত্রীকে তালাক দিতে বাধ্য হয়।[১০]

চরে বাল্যবিবাহের বেশ চল দেখা যায়। *চরকাশেম* উপন্যাসের ফুলমনের বিয়ে হয়েছে তিন বছর বয়সে এবং আঞ্জুর পাঁচ বছরের মেয়ের সঙ্গে হাফিজের আড়াই বছরের ছেলের বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। এ বাল্য বিয়ে ঠিক হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ 'পণ' থেকে ছেলে পক্ষের মুক্তি।[১১] 'ঢেউ জাগে পদ্মায়' উপন্যাস হতে অবশ্য জানা যায় সচ্ছল পরিবারের মেয়েদের বাল্যবিবাহের প্রবণতা কম ছিল।[১২] বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে বাংলার চরাঞ্চলে তথা গ্রামাঞ্চলে বাল্যবিবাহের অন্যতম প্রধান কারণ 'সারদা আইন' (১৩৩৬)। গ্রামাঞ্চলে বিশেষভাবে ছড়িয়ে পড়ে যে উক্ত আইন পাস হলে ছেলে-মেয়ের বিয়ে দেওয়া সহজ হবে না। ফলে উক্ত আইন পাশ হবার পূর্বেই অভিভাবকবৃন্দ ছেলে মেয়ের বিয়ে দিতে উঠে পড়ে লাগে। সে সময় সদ্যোজাত অনেকের বিয়ে হয়েছে। এমনকি গর্ভস্থ অনাগত শিশুর বিয়ের ঘটকালির দৃষ্টান্তও তখন পাওয়া গিয়েছে বলে জনশ্রুতি আছে।[১৩]

বাংলা উপন্যাসে প্রতিফলিত পূর্ব বাঙলার চরাঞ্চলের অধিকাংশ মাতব্বর ধর্মে মুসলমান বলে তাদের ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী একসঙ্গে চারজনের বেশি স্ত্রী রাখে না। এজন্যই চরাঞ্চলে তালাকপ্রাপ্ত নারীর সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশি। অন্যদিকে সংগ্রামশীল জীবন ও বাল্যবিবাহের কারণে বিধবার সংখ্যাও নেহাৎ কম নয়। সংগত কারণেই চরাঞ্চলের নারীর পরিণতি অনুধাবনের ক্ষেত্রে বিধবা ও তালাকপ্রাপ্ত নারীর সামাজিক অবস্থান ও মর্যাদা খুঁজে দেখা দরকার।

সাধারণভাবে তালাকপ্রাপ্ত নারীর তেমন কোনো সমস্যা দেখা যায় না। *শংখ নদীর তীরে*'উপন্যাসে দেখা যাচ্ছে তোরাবের তালাকপ্রাপ্ত সাবেক তিন স্ত্রী পরবর্তী সময়ে অন্য তিনজনের ঘর করছে।[১৪] সাধারণ নিয়মে সুন্দর নারীকে কেউ সহজে তালাক দিতে চায় না। ঘটনাক্রমে সন্তানহীন সুন্দরী তালাকপ্রাপ্ত হলে তার বিয়ের প্রস্তাব আসতেই থাকে এবং তার বিয়ের পণও উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে।[১৫]

মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্যরত্নের *আনোয়ারা* উপন্যাসে দেখা যায় অপেক্ষাকৃত নামহীন পরিবারের সুন্দরী বিধবার সঙ্গে উচ্চ বংশের পুরুষের বিয়ে হলে মেয়ে পক্ষকেই পণ দিতে

হয়। উক্ত উপন্যাসে ভুবনমোহিনী সুন্দরী—ডাকের সুন্দরী গোলাপজানের বালিকা বয়সে মেহের আলীর সঙ্গে বিয়ে হয়। বিয়ের পর মাঝে মাঝেই সে স্বামীর বাড়ি থেকে বাবার বাড়ি চলে আসত। এরই ধারাবাহিকতায় স্বামীর ঘর হতে রাতে শ্রাবণের ভরা নদী সাঁতরিয়ে পার হয়ে সে বাপের বাড়ি চলে আসে—আর ফিরে যায় না। সুন্দরী বলেই ইদ্দতকাল (তিন চান্দ্র মাস) পার না হতেই তার পুনরায় বিয়ের কথা পাকা হয় এবং ইদ্দতকাল পার হবার পর বিয়ে হয়। এই ঘরে এক পুত্র সন্তানের জন্মের পর স্বামী নবীবক্সের মৃত্যু হয়। নবীবক্সের মৃত্যুর পর গোলাপজান একমাত্র পুত্র বাদশাকে নিয়ে ভাইয়ের বাড়ি চলে আসে। সুন্দরী বলেই পরে বিপত্নীক খোরশেদ আলী ভূঞা তাকে বিয়ে করে এবং বাদশাও তার মায়ের সঙ্গে থেকে যায়—অবশ্য গোলাপজানদের বংশের বদনাম থাকায় উক্ত বিয়েতে খোরশেদ আলী ভূঞা তিনশত টাকা সেলামি নেয়।[১৬]

বাংলা উপন্যাস হতে জানা যায় চরাঞ্চলে তালাক দেওয়া নিয়ে যাচ্ছেতাই কাণ্ডকারখানা ঘটে। ঘরে চারটি স্ত্রী থাকলে এবং পঞ্চম কাউকে পছন্দ হলে সম্পূর্ণ অকারণে চারজনের যে কোনো একজনকে তালাক দেওয়া হয়। *পদ্মার পলিদ্বীপ* উপন্যাসে দেখা যায় সুন্দর মেয়ের বাবা নানা অজুহাতে মেয়ের তালাক নিয়ে দুদিক থেকে লাভবান হয়। বিয়ের 'মোহর' স্বরূপ পূর্ব জামাই এর দেওয়া গয়না রেখে দেয় এবং পুনরায় পণ নিয়ে মেয়ের বিয়ে দেয়। এসব ক্ষেত্রে ছেলে তালাক দিতে না চাইলে তার উপর জোর প্রয়োগ করা হয় এবং তাতেও সফল না হলে চালাকির আশ্রয় নেওয়া হয়। উক্ত উপন্যাসে আরশেদ মোল্লা তার মেয়ে রূপজানের তালাকের চেষ্টায় জোর প্রয়োগ করে তালাকের কাগজে জামাই ফজলের টিপসই নিয়েছে—অথচ তালাক সম্পর্কে মেয়ে রূপজান কিছুই জানে না। রূপজানের তালাক নেওয়ার ক্ষেত্রে আরশেদ মোল্লা মরিয়া এ কারণে যে তালাক কার্যকর হলে ফজলদের বাড়ি থেকে দেওয়া গয়না ফেরত দিতে হবে না এবং মেয়ের পুনরায় বিয়ে দিয়ে পণ হিসেবে ২০ (কুড়ি) নল জমি পাওয়া যাবে। জোর করে মেয়ের তালাক নিতে না পেরে অবশেষে আরশেদ মোল্লা তথাকথিত পিরের সাহায্য নেয়। বাল্য বিবাহও কখনো কখনো তালাকের কারণ হয়েছে। *পদ্মার পলিদ্বীপ* উপন্যাসের ১১ বছরের ফজলের সঙ্গে ১০ বছরের জরিনার বিয়ের পাঁচবছর পরেই গোঁফের রেখা স্পষ্ট না হওয়া নবম শ্রেণির 'আবাত্তি' (কিশোর) ফজলের পাশে প্রায় যৌবনবতী জরিনাকে দেখে ফজলের বাবা ইরফান মাতব্বর প্রমাদ গোনে। ছেলে-বউ-শারীরিক সম্পর্কে জড়িয়ে পড়লে ছেলের আর লেখাপড়া হবে না আন্দাজ করে ইরফান মাতব্বর ছেলেকে 'তিন তালাক বায়েন' উচ্চারণে বাধ্য করে।[১৭]

চরে সুন্দর বিধবা বা সম্পত্তিওয়ালা বিধবার সামাজিক অবস্থান বেশ ভালো। *পদ্মার পলিদ্বীপে* দেখতে সুন্দর বিধবা হাজেরার বর্তমান স্বামী তার পূর্ব স্বামীর ঔরসজাত শিশুকে 'হাতুয়া পোলা' হিসেবে নিজের কাছে রাখে।[১৮] অন্যদিকে *চর আতরজান* উপন্যাসে নিঃসন্তান তরুণ বিধবা আতরজানের সঙ্গে পাশের চরের ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য ও গ্রাম সরকার আলতাফ সিকদারের বিয়ের কথাবার্তা হয়। দশ ক্লাশ পর্যন্ত পড়া 'এ-লে-বি-লে' পাশ আলতাফ সিকদার পালকিতে চড়ে হাটে যায়—যখন হাঁটে তখন তার মাথায় ছাতা ধরে পাইক-

পেয়াদা। উক্ত সম্বন্ধের কারণ বিধবা আতরজানের নামে যে জমি আছে তাতে প্রতি খোন্দে কমপক্ষে তিনহাজার মণ ধান পাওয়া যাবে।[১৯]

সামাজিক অবস্থান

বাংলা উপন্যাস হতে চরের নারীদের সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যায়। চরের অবস্থাপন্ন, সুন্দর নারীদের বাদ দিলে অন্যান্য নারীর সামাজিক অবস্থান বড়ই শোচনীয়। সাধারণভাবে বিবাহিত নারী পুরুষের ইচ্ছের কাছে বাঁধা থাকে। *শংখ নদীর তীরে* উপন্যাসে দেখা যায় চরের ক্ষমতাধারীরা কাঙ্ক্ষিত নারীকে বিয়ে করতে না পারলে ছলে বলে কলে কৌশলে এক রাতের জন্য হলেও ঘরে তোলে। কেবল পছন্দনীয়ই নয়—বাবা বা স্বামীকে শাস্তি দেওয়ার জন্যও নারী অপহরণ করা হয়। রাতের অন্ধকারে অপহরণ করে ভোর হবার আগেই তাকে ঘরে পৌঁছে দেওয়া হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে নারীর স্বামী নারীকে ঘর থেকে বের করে দিতে পারে না। কারণ স্বামীর যে কোনো ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়ায় অপহরণকারী দলবল নিয়ে এই বলে নারীর পক্ষ অবলম্বন কনোরে যে—যা ঘটে গেছে তাতে নারীর কোনো অপরাধ নেই—সব অপরাধ অপহরণকারীর। কাজেই শত অপমানের বোঝা বহন করে নারীকে ঘরেই থাকতে হয়।[২০] আবদুর রশীদ ওয়াসেকপুরীর *বান* উপন্যাসে জানা যায় ঘরের বউকে অপহরণের পর রাতের অন্ধকারে ঘাটে ফেরত দেয়া হলে জিন/ভূতের আসরের আড়ালে কিছুটা হলেও তার সামাজিক সম্ভ্রম রক্ষা পায়।[২১] *পদ্মার পলিদ্বীপ* উপন্যাসে ভোররাতে নদীতে গোসল করতে গিয়ে নিখোঁজ সবুরনকে একদিন একরাত পর প্রায় ভোরে যখন সেই ঘাটেই পাওয়া যায়—তখন তার শরীর ও পরিধান থেকে সুগন্ধ ভেসে আসে। গ্রামের লোক দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে সবুরন জিনের কুদৃষ্টির শিকার। ফলে নিশ্চিত বিপর্যয়ের হাত থেকে সবুরনের দাম্পত্য জীবন রক্ষা পায়। অথচ বাস্তবতা এই যে, সবুরনকে কয়েকজন গোরা সৈন্য তুলে নিয়ে গিয়েছিল এবং গোরা সৈন্যরা সুযোগ পেলেই নদীতে স্নানরত নারীদের টাকা দিয়ে বশ করার চেষ্টা করতো।[২২] অনেকেই প্রকাশ্যে নারী অপহরণ করে ঘরে রেখে, কোনোটাকে বা বিয়ে করে—আবার কোনোটাকে কয়েকদিন পরে ছেড়ে দেয়।[২৩] বাংলা উপন্যাসে দেখা যায় ক্ষমতাধররা অন্যের কন্যা-বধূ ছিনিয়ে এনে অঙ্কশায়িনী করেছে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের *উপনিবেশ* উপন্যাসে দেখা যায় গঞ্জালেজের পূর্বপুরুষ (পর্তুগিজ) বিয়ের আসর থেকে বিয়ের কনে অপহরণ করার পর তাকে বিয়ে করেছে। বার্মিজ লিসির প্রেমিক জোহানকে হত্যা করে লিসিকে অপহরণ করা হয়েছে।[২৪] 'ঢেউ জাগে পদ্মায়' উপন্যাসে কোনো কোনো ক্ষেত্রে অত্যাচারিত নারী আত্মহত্যা করে রেহাই পেয়েছে। অবশ্য অপহরণ, বলাৎকার বা আত্মহত্যার শিকার নারীর পক্ষ থেকে কোনো মামলা করার সাহস কেউ পেত না। কেবল পুলিশ কিছুটা মাতামাতি করলে নানা কৌশলে ক্ষমতাধররা তাদের 'ঠাণ্ডা' রাখে। উক্ত উপন্যাসে আনোয়ারা কুমারী অবস্থায় গর্ভবতী হয়ে সমাজের তাড়া খেয়ে ভগ্নিপতির বাড়িতে আশ্রয় নিয়ে মেয়ের জন্ম দেয়। অতঃপর ভগ্নিপতি কর্তৃক ধর্ষিত হয়ে নিজ গ্রামে ফিরে এসে সমাজের চাপে আত্মহত্যা করে এবং তার মেয়েকে শিয়ালে খায়। কিন্তু আনোয়ারার ক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে শত চাপেও সে তার প্রেমিকের নাম ফাঁস করেনি।[২৫]

চরের নারীদের মধ্যে প্রেমিককে রক্ষা করার প্রবণতা লক্ষণীয়। *উপনিবেশ* উপন্যাসের মা-ফুন তহশিলদার মণি-মোহনের সঙ্গে চর থেকে চলে যেতে রাজি হয়েও ভবিষ্যতে মণি-মোহনের অবস্থান চিন্তা করে দুর্যোগের সুযোগে মণি-মোহনকে না জানিয়ে নৌকা থেকে নেমে যায়। মা-ফুন মণি-মোহনের কাছে নালিশ করেছিল তার স্বামী পরনারী আসক্ত অথচ দুর্যোগের একরাতে মা-ফুন নিজেই মণি-মোহনকে শয্যায় আসতে বাধ্য করে। মণি-মোহন আমতা আমতা করলে মা-ফুন নিজের কাছে রক্ষিত ছুরির ভয় দেখিয়ে মণি মোহনকে শয্যায় টেনে নেয়।[২৬] *ঢেউ জাগে পদ্মায়* উপন্যাসে দেখা যায় ভাগ্যক্রমে কোনো মজুরের ঘরে সুন্দর স্ত্রীর আগমন ঘটলে জোতদার সেই মজুরকে বউ তালাক দিতে বলে। মজুর বউ তালাক দিতে অনীহা প্রকাশ করলে কৌশলে তাকে প্রবাসে পাঠিয়ে জোতদার তার বউকে ভাগিয়ে নেয় এবং প্রবাস ফেরত মজুর আর তার বউকে ফিরে পায় না।[২৭]

চরজীবনের ভাগ্য বিড়ম্বিত নারীর আদর্শ উদাহরণ হতে পারে *ঢেউ জাগে পদ্মায়* উপন্যাসের ফুলজান বা *পদ্মার পলিদ্বীপ* উপন্যাসের জরিনা। ফুলজানের বিয়ে হয়েছে বেশ কয়েকবার কিন্তু তার ভাগ্যের কোনো পরিবর্তন হয়নি। তার প্রথম স্বামী জোয়ান সাদেক পদ্মায় ডুবে মারা যাওয়ার পর নিজেকে বাঁচাতে সে আন্দু শেখকে (৫০) বিয়ে করে। প্রায়বৃদ্ধ আন্দু শেখ বিয়ের অল্প দিন পর মারা গেলে আজিজ ব্যাপারীর ছেলে মদনকে সে বিয়ে করে। সাদেকের মৃত্যুর পর উক্ত মদন তাকে খুব জ্বালিয়েছে। বহুগামী মদন ছিল সিফিলিস আক্রান্ত এবং সেই রোগেই সে মারা যায়। মদনের বিষ নিঃসন্তান ফুলজানের শরীরে প্রবেশ করলেও তা প্রকাশ পায় না। সিফিলিস আক্রান্ত কামতাড়িত ফুলজান একরকম ফাঁদে ফেলে হাবিবুল্লাহকে বিয়ে করে। বিয়ের পর সিফিলিসের সংক্রমণে হাবিবুল্লার মৃত্যু হলেও ফুলজানের শরীরে তখনো রোগের লক্ষণাবলি প্রকাশিত হয় না। উক্ত প্রেক্ষিতে গ্রামের প্রভাবশালী মাতব্বর হাতেম খাঁকে ফাঁদে ফেলে সে বিয়ে করে। কিন্তু এখানেই শেষ নয়—পরবর্তী পর্যায়ে হাতেম খাঁর অনুপস্থিতির সুযোগে সে তার চেয়ে দশ বারো বছরের ছোট কালুর সঙ্গে প্রণয় সম্পর্ক স্থাপন করে এবং দূরে বসবাস করার মানসে হাতেম খাঁর টাকা পয়সা চুরি করে দুজনে পালিয়ে যাবার পথে হাতেম খাঁ ও ফয়েজের হাতে ধরা পড়ে। ফুলজান ও কালুকে থানায় সোপর্দ করা হয়।[২৮]

পদ্মার পলিদ্বীপ উপন্যাসের জরিনার বিষয়টি অন্যরকম। দশ বছর বয়সে এগার বছরের ফজলের সঙ্গে তার বিয়ে হয়। পাঁচ বছর পর ছেলের পড়াশোনার ক্ষতির ভয়ে প্রায় তরুণী জরিনাকে তালাক দিতে বাধ্য করে ফজলের বাবা ইরফান মাতব্বর। কিন্তু জরিনাকে তালাক দেওয়ার জন্য ফজলের মনে একধরনের অপরাধবোধ কাজ করে এবং জরিনাকে সে ভুলতে পারে না। ঘটনাক্রমে বর্তমান শ্বশুরবাড়িতে একরাতে ফজল তার বউ মনে করে যাকে আদর করে সে তার বউ রূপজান নয়—প্রাক্তন বউ জরিনা। ফজল যখন বুঝতে পারে মিলনরত নারী তার রূপজান নয় তখন সে আর ফিরতে পারে না। কেননা ততক্ষণে সে চিরকালীন যে কোনো পুরুষ এবং যে নারী তার সঙ্গে মৈথুনরত সে চিরকালীন যে কোনো নারী—তার নাম নেই, পরিচয় নেই। কিন্তু জরিনার ক্ষেত্রে বিষয়টি ভিন্ন। জরিনা তার সকল দ্বিধা সংশয় ফেলে রেখেই অত্যন্ত সচেতনভাবে ফজলের সঙ্গে মিলনের সুযোগ নিয়েছে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে জেল পলাতক ফজল রাতের আঁধারে জরিনার গৃহ হতে খাবার নিয়ে জরিনার মাথা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করে তিন চারদিন পর সে

জরিনার গৃহে ফিরে আসবে। ফজলকে কাছে পাওয়ার সম্ভাবনায় জরিনা কৌশলে শাশুড়িকে তার বোনের বাড়ি চর কানকাটায় পাঠিয়ে দেয়। ফজলের পছন্দীয় খাবারের উপকরণ সংগ্রহ করে। অথচ ফজলের আসার সম্ভাবনা যত ঘনিয়ে আসে ততই জরিনার মনের পরিবর্তন ঘটে এবং এক পর্যায়ে ফজলকে তার 'বেগানা পুরুষ' মনে হয়। ফলে সে নিয়মিত নামাজ পড়তে শুরু করে এবং মোনাজাতের সময় শরীর মন চোখ ইত্যাদির গুনাহ হতে খোদাতায়ালার কাছে ক্ষমা চায়। একরাতে ফজলের উপস্থিতি টের পেয়ে সে ঘর থেকে বেরিয়ে রান্নাঘরের পিছনে নিজেকে লুকিয়ে রাখে। জরিনাকে না পেয়ে ফজল ফিরতে শুরু করলে জরিনার বুকের ভিতর মোচড় দিয়ে ওঠে—রিক্ততার হাহাকার তার শরীর মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। পরক্ষণেই ফজলের ফিরে আসার পদশব্দ শুনে তার বুকের হাহাকার থামে কিন্তু সে ফজলের সামনে আসে না। অবশেষে জরিনা যখন বুঝতে পারে ফজল ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর তখন সে আর নিজেকে ধরে রাখতে পারে না। তার বুকের ঝড় সব বন্ধন ছিন্ন ভিন্ন করে দেয়। চোখের জলের প্লাবনে সব দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ভেসে যায়। খাওয়ার পর নিজ বিছানায় ফজলকে শুইয়ে দিয়ে ঘর অন্ধকার করে নামাজের মাদুর বিছিয়ে তার উপর সে বসে পড়ে। শয়তানের প্ররোচনা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সে তার আসনের চারদিকে তিনবার দাগ দেয়—যেন শয়তান কোনোভাবেই সে দাগ ডিঙাতে না পারে। মশারির মধ্যে ফজলের বিড়ির আগুন আলোয় আকৃষ্ট পতঙ্গের মতো জরিনাকে টানতে থাকলে সে চোখ বন্ধ করে দুহাত দিয়ে নামাজের মাদুরটা শক্ত করে ধরে রাখে। অনেকক্ষণ পর চোখ খুললে জরিনার ঘুমন্ত আবেগ পুনরায় জেগে ওঠে এবং আবেগকে প্রশমিত করার জন্য তার 'মুসল্লী' বাপের স্মৃতিধন্য 'হাজার দানার তসবী'র আবেষ্টনীর মধ্যে বসে থেকে রাত পার করে। পরবর্তী পর্যায়ে পাটের জমির ভিতর বানানো টং এ ঘুমন্ত ফজলকে দেখে জরিনার মনের মধ্যে কামের উদ্রেগ হলেও সর্বশক্তি দিয়ে সে তা প্রতিরোধ করে। অবশ্য ঘুমন্ত ফজলকে দেখতে দেখতে এক পর্যায়ে সে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে শরীরের পাপের জন্য তাকে ও ফজলকে একসঙ্গে দোজখে থাকতে হবে। এ কথা ভাবার সঙ্গে সঙ্গে জরিনার পাপবোধ অনেকটাই কমে যায়। ফলে ঘুম ভেঙে পাশে বসে থাকা জরিনাকে ফজল যখন কাছে টানে সে বাধা দেয় না। ফলশ্রুতিতে জরিনা গর্ভবতী হয়ে পড়ে এবং তার দুশ্চিন্তার শেষ থাকে না। কারণ অন্য কেউ না জানলেও তার স্বামী হেকমত জানে যে তার নিজের সন্তান উৎপাদনের কোনো ক্ষমতা নেই। ঘটনাপ্রবাহে রাতের অন্ধকারে হেকমত বাড়ি আসলে সেই রাতেই কৌশলে হেকমতকে বিদায় দেবার ফন্দি আঁটে জরিনা। কারণ রাত পোহালেই জরিনার শরীর দেখে হেকমত যা বুঝার তা বুঝে নেবে। কিন্তু জরিনা তার ফন্দি কাজে লাগাবার আগেই নদীতে মাছ ধরতে গিয়ে হেকমত মারা যায়। হেকমতের মৃত্যুকে 'খুন' হিসেবে প্রমাণের মাধ্যমে চরের ক্ষমতাধর জঙ্গুরুল্লা প্রতিপক্ষ দলকে ফাঁসাতে সচেষ্ট হয়। কিন্তু জরিনার সত্য কথন ও অনঢ় অবস্থানের কারণে জঙ্গুরুল্লার ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হলে ক্ষুব্ধ জঙ্গুরুল্লা তার দলবল দিয়ে জরিনাকে ধরে এনে কেটে নদীতে ভাসিয়ে দেয়।[২৯]

উপনিবেশ উপন্যাসে মুক্তোকেশী জরিনার বিপরীত অবস্থানে উন্নীত। মুক্তোকেশী সন্তানবতী না হলে তার স্বামী গুড়ের ব্যবসায়ী নবদ্বীপ সরকার পুনরায় বিয়ে করে। মুক্তোকেশী বাবার বাড়ি ফিরে আসলে দুষ্টচক্রের উৎপাত বাড়তে থাকে। এ পর্যায়ে চর ইসমাইল প্রবাসী ফরিদপুর অঞ্চলের বিপত্নীক বলরাম ভিষকরত্ন তার দূর সম্পর্কের আত্মীয় মুক্তোকেশীকে নিয়ে আসে।

বলরামের গৃহে অবস্থানের এক পর্যায়ে বলরাম মুক্তোকেশীর কাছে প্রণয় নিবেদন করে ব্যর্থ হয়। কিন্তু একদিন ঝড়বৃষ্টির রাতে মুক্তো বলরামের বাহুডোরে ধরা দেয়—সমাজের কোনো নীতিকে তোয়াক্কা না করে—'সৃষ্টিছাড়া দেশের (চরের) সামাজিক বিশৃঙ্খলাকে' তারা মেনে নেয়।[৩০] পরিণতিতে মুক্তোকেশী গর্ভে সন্তান ধারণ করলে বলরাম মুক্তোকে আছাড় দিয়ে তার গর্ভের সন্তান নষ্ট করে। অতঃপর সুস্থ হয়ে মুক্তো বলরামকে ছেড়ে সুযোগ মতো নূরুল গাজীর সঙ্গে চলে যায়। নূরুল গাজীর মৃত্যুর পর সম্পত্তির লোভে তার পুত্ররা মুক্তোকে মেরে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়। এই অবস্থায় বলরাম মুক্তোকে পেয়ে 'স্ত্রী' হিসেবে গ্রহণ করে। বিপুল সম্পত্তি ফেলে ঘুমন্ত বিক্ষত মুক্তোকে নিয়ে বলরাম শহরের দিকে যাত্রা শুরু করে এই প্রত্যাশায় যে বিশাল পৃথিবীর কোনো না কোনো স্থানে তারা বাঁচার পথ খুঁজে নিতে পারবে।[৩১]

বাংলা উপন্যাসে দেখা যায় চরের বিবাহিত নারী সাধারণত পুরুষের ইচ্ছের কাছে বাধা থাকে। কখনো কখনো তারা পুরুষের বিশেষ করে বাবা-স্বামী-শ্বশুরের ইচ্ছের বিরুদ্ধাচরণ করতে চেয়েছে বটে কিন্তু প্রায় ক্ষেত্রেই সফল হয়নি। *পদ্মার পলিদ্বীপ* উপন্যাসে ফজলের মা (ইতোমধ্যে চর দখলের মারামারিতে যার বড় ছেলে শিশুপুত্র রেখে খুন হয়েছে) স্বামী-পুত্র কাউকেই শত চেষ্টা করেও চর দখল প্রক্রিয়া থেকে ফিরিয়ে আনতে পারে না। রূপজানের মা সোনাই বিবি মেয়ের তালাক—পুনরায় বিয়ে ইত্যাদি বিষয়ে স্বামী আরশেদ মোল্লার ব্যবহারে ত্যক্তবিরক্ত হয়ে উপলব্ধি করেছে শারীরিক-মানসিক নির্যাতনের শিকার রূপজানের পুনরায় বিয়ে দিয়ে তার বাবা আরশেদ মোল্লা মেয়েকে একেবারে কবরে দিতে চায়। সোনাই বিবির ভাবনা তার স্বামীর কোনো কাজকে প্রভাবিত করতে পারে না বটে কিন্তু উক্ত ভাবনা তার মনোজগতের শাশ্বত মাতৃবেদনাকে উদঘাটিত করে। অন্যদিকে ফজল ও তার দলবল (জঙ্গুরুল্লার দলবলের ছদ্মবেশে) রূপজানকে জোর করে ধরে নিয়ে যেতে চাইলে মা সোনাই বিবি মেয়েকে বাঁচানোর আপ্রাণ চেষ্টা করে। অনুপ্রবেশকারীদের রামদা দেখে এতটুকুও না ঘাবড়িয়ে সে শেষ অস্ত্র হিসেবে অনর্গল গালি-গালাজ দিতে থাকে—তাদের মা-বোনের দোহাই দেয়। এক পর্যায়ে সত্য গোপন করে সে বলে মেয়েকে ইতোমধ্যেই জামাই নিয়ে গেছে—মেয়ে ঘরে নেই। কিন্তু এক্ষেত্রেও তার চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও পিরের কথিত যাদু টোনার ব্যবহার সে মেয়ের উপর প্রয়োগ করে। কারণ স্বামীর আদেশ অমান্য করার সাহস তার ছিল না। অবশ্য দুএকটা কাজে সোনাইবিবি সফল হয়েছে। স্বামীর মতলব বুঝতে পেরে ফজলদের দেওয়া গয়না মেয়ের সহায়তায় ফজলদের বাড়ি পাঠিয়ে দিতে পেরেছে। আর ফজলের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য আরশেদ মোল্লা রূপজানকে জঙ্গুরুল্লার বাড়ি পাঠাতে চাইলে সোনাই বিবি তা রুখে দিয়েছে। অন্যদিকে সোনাই বিবির কন্যা রূপজানের মধ্যে কিছুটা স্বাধীন সত্তা লক্ষণীয়। সে মায়ের সহায়তায় ফজলদের দেওয়া গয়না ফেরত দিতে পেরেছে, ফজলের তালাক দেওয়ার কথা শুনে অজ্ঞান হয়ে পড়েছে—এমনকি এক পর্যায়ে আত্মহত্যার কথাও ভেবেছে। বাবার ইচ্ছে জানার পরও রাতের অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে কাছারি ঘরে স্বামীর কাছে যাবার চেষ্টা করেছে। তার বাবা আরশেদ মোল্লা বুঝতে পেরেছে জেল পলাতক ফজল সুযোগ পাওয়া মাত্রই মেয়েকে ভাগিয়ে নিয়ে যাবে এবং এক্ষেত্রে মেয়ের কোনো আপত্তি থাকবে না। কেবল তাই নয়—মেয়ের মতিগতি দেখে বাবা বুঝতে পারে মেয়ে চিঠি লিখে ফজলকে ডাকতে পারে বা নিজেই কোনো ব্যবস্থা করে ফজলের কাছে চলে যেতে পারে। পিরের সঙ্গে বিয়ে প্রসঙ্গে সে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যার

হুমকি দেয়। তাকে পিরের অনুরক্ত করার জন্য জাদুটোনার আশ্রয় নেওয়া হলে সে তা বুঝতে পেরে রাতে ঘুমায় না। কারণ তার মনে হয়েছে ঘুমালেই স্বপ্নের মাধ্যমে তার আত্মা পিরের কাছে চলে যাবে। তার মা পিরের শেখানো কথা তার সামনে উচ্চারণ করলে সে কানে আঙুল দিয়ে মাটিতে লাথি মারার মাধ্যমে জাদুটোনার কপালে ও মুখে লাথি মারে। ব্যাপারটা বাড়াবাড়ি পর্যায়ে পৌঁছুলে সে মাটিতে বাম পায়ের লাথি মারার মাধ্যমে টোনার কোমরে একশ একটা বাম পায়ের লাথি মেরে টোনাকে অপমান করে। আরশেদ মোল্লা বুঝতে পারে জাদুটোনা দিয়ে তার মেয়ের মন ফেরানো যাবে না। আবার ফজলের দল জঙ্গুরুল্লার লোকের ছদ্মবেশে রূপজানকে রাতের আঁধারে জোর করে তুলে নিতে চাইলে সে প্রবলবেগে বাধা দেয়। দরজা ভেঙে ঘরে লোক প্রবেশ করা মাত্রই সে হাতের কাছে যা পেয়েছে তাই ছুঁড়ে মেরেছে। প্রবল গালি-গালাজসহ হাতে দা নিয়ে সে প্রতিপক্ষকে হত্যার হুমকি দিয়েছে। তাতেও কাজ হল না দেখে সে পিছনের দরজা দিয়ে নদীর দিকে দৌড় দিয়েছে। শেষ পর্যন্ত আততায়ী তাকে ধরে ফেললে সে মুখে গালি আর হাতের নখের সাহায্যে আততায়ীর শরীরে খামচি দিয়ে মুক্ত হতে চেষ্টা করেছে এবং তাতে ব্যর্থ হয়ে এক পর্যায়ে জ্ঞান হারিয়েছে।[৩২]

বাংলা উপন্যাসে প্রতিফলিত চরের নারীদের মধ্যে অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসের রমুর মা খুশীর চরিত্রে একটি ভিন্নমাত্রা লক্ষিত হয়। খুশীর বাবা মেয়ের বিয়ের গয়না ও বরপক্ষের দাবির কাছে হার মেনে জমি বন্ধক রাখতে বাধ্য হয়েও মেয়ের গয়নার দায় মেটাতে পারেনি। গর্ভবতী হওয়ার পর খুশীকে তার বাবা নিতে আসলেও গয়নার দেনার লজ্জায় খুশীর শ্বশুরকে কোনো কিছু বলতে পারে না—তার মধ্যে চোর চোর ভাব প্রকটভাবে ধরা পড়ে। বাপের অসহায়ত্ব মেয়েকে 'বিদ্রোহী' করে তোলে—সে নিজেই নিজের ও বাপের কথা শ্বশুরকে জানানোর সিদ্ধান্ত নেয়। শ্বশুরবাড়িতে বাপ-শ্বশুরের কথা কাটাকাটি শুরু হলে বাপকে অসম্মানিত হতে দেখে খুশী তার বাপকে এ বলে ভর্ৎসনা করে—সে কেন অপদস্থ হতে বেহাই বাড়ি এসেছে। রমুকে বিদ্যালয়ে দেওয়া না দেওয়া নিয়ে বাপ কাদিরের সঙ্গে ছেলে ছাদিরের কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে নিজের অনুপস্থিত বাপকে অসম্মানিত হতে দেখে খুশীর মুখের আগল খুলে যায়। সে শ্বশুর ও স্বামীকে উল্টো অভিযোগ করে সব জেনে শুনে কেন তাকে ঘরে আনা হয়েছে। ভুল করে যদি আনা হয়েই থাকে তবে ভুল বুঝতে পারার পর কেন তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হলো না? বিব্রত স্বামী ছাদির তাকে 'বিষমুখী' বলে থামাতে চাইলে অভিমানী খুশী ফোঁস করে ওঠে—'ইস থামিবে। আমি বিষমুখী, আমার বাপ চোর, আবার থামিবে।' স্বামীর মার খাওয়া থেকে শ্বশুর খুশীকে রক্ষা করার পরও তার মুখ চলতে থাকে। সে আক্ষেপ করে বলে চোর-বদমাস যাই হোক না কেন—তার বাপ কেবল তারই বাপ—অন্য কোনো ব্যক্তির বাপ না। কাজেই সে যদি মরে যায় কেবল তার বাপের বুকই খালি হবে—অন্য কোনো বাপের বুক খালি হবে না। যে ঘরে এসে মেয়ে হয় বিষমুখী আর বাপ হয় চোর সংগত কারণেই সে ঘরকে লোকে পরের ঘর বলে। কথা শেষে খুশী কাঁদে—অনেকক্ষণ কাঁদে এবং কান্না শেষে তার মনে হয় এমন কাঁদন কেঁদেও সুখ। পুত্রবধূর মধ্যে 'বিদ্রোহের মূর্তি' দেখে শ্বশুরের চেতনা হয়—পুত্রবধূ শ্বশুরের মেয়ের স্থান অধিকার করে—খুশীও তার ছেলে রমুকে বিদ্যালয়ে পাঠাতে পারে। অবশ্য উক্ত ঘটনাবলির পূর্বেই খুশীর পরাধীনতাজনিত পীড়নের কথা জানতে পারা যায়।

কাজ করতে করতে হাতের চুড়ি ইত্যাদি ভেঙে গেলে তার শ্বশুর রাগ করে কথাচ্ছলে তার বাপকে খোঁটা দেয়। স্বামী ছাদিরের কাছ থেকে দুএকটা পয়সা পেলে বেদেনীর কাছ থেকে গোপনে চুড়ি কিনে সে শূন্যতা পূরণ করতে পারত—কিন্তু ছাদির তাকে কোনো পয়সা দেয় না। অনুরূপ অবস্থায় তার নিজেকে খুব অসহায় মনে হয় এবং রমুর জন্মের পর সে এই স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসে যে রমু বড় হয়ে যখন সংসারের দায়িত্ব পালন করবে তখন কি রমুর মা হিসেবে কিছুটা স্বাধীনতা সে ভোগ করবে না?[৩৩]

রমেশচন্দ্র সেনের *কুরপালা* উপন্যাসে নারীদের ভিন্নমাত্রায় উপস্থাপিত হতে দেখা যায়। গ্রামের পুরুষরা ক্ষমতাসীনদের ভয়ে জমি ছেড়ে চলে গেলে তাদের মা-স্ত্রীরা ক্ষমতাসীনদের গালি পাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বোকামির জন্য নিজ নিজ স্বামী সন্তানকে ভর্ৎসনা করে। এরই ধারাবাহিকতায় জগুর স্ত্রী হাস্য দারোগার মুখে মুখে কথা বলে 'জবরদস্ত' মেয়ে হিসেবে গ্রামে খ্যাতি পায়। উক্ত উপন্যাসের 'জবরদস্ত' মেয়েরা ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে এবং শাস্তি স্বরূপ পুলিশ তাদের ধরে নিয়ে নৌকায় করে প্রায় সন্ধ্যায় পাশের জেলার মধুমতীর নদীর নির্জন চরে নামিয়ে দেয়। চরে মেয়েরা জড়াজড়ি করে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে বিভীষিকাময় রাত পার করে। রাতে পুরুষ মানুষের ভয়ে তারা দাঁড়ের শব্দ শুনেও নিশ্চুপ থাকে। পরদিন কিছুটা কুমিরের ভয়ে এবং মূলত পুরুষের ভয়ে তারা নদীর কাছাকাছি আসে না। প্রায় সন্ধ্যায় তারা পরিচিত যদু সাহার নৌকায় ঘরে ফিরে আসে এবং যদু সাহার মাধ্যমে জানতে পারা যায় অনুরূপ দৃশ্য আরও দুই/তিন জায়গায় দেখা গেছে।[৩৪]

সিরাজুল ইসলাম মুনিরের *পদ্মা উপাখ্যান* উপন্যাসে জানা যায় দুই বাংলার সীমান্তের চরাঞ্চলে চোরাচালান ইত্যাদির সঙ্গে জড়িত যে সব নারী তারা প্রায় সকলেই অস্বাভাবিক জীবন যাপনে বাধ্য হয়। অনেক সময় এপারের অভাবী মেয়েরা নানা প্রলোভনে ওপারে পালিয়ে যায় এবং দুর্ভাগ্যক্রমে প্রায় তাদের আস্তানা হয় ওপারের কোনো নিষিদ্ধ পল্লিতে। যারা এপারেই থাকে তারা শরীর ব্যবহার ও ঘুষ দিয়ে চোরাচালানের কাজ চালিয়ে যায়।[৩৫] আবুল বাশারের 'ভোরের প্রসূতি' উপন্যাস হতে জানা যায় ফরিয়াদীর চরের সীমান্ত সংলগ্ন বালুঘরী বাজারে দুইপারের টাকা বিনিময়, জুয়া ও দালালিসহ নানা ফিকিরে এক শ্রেণির মানুষ ঘোরে। বিশেষ করে ট্রাক ও লরির চালকরা নদীর পূর্ব পার থেকে পশ্চিম পারে চলে আসতে বাধ্য হওয়া কোনো কোনো মেয়েকে আজিমগঞ্জের নিষিদ্ধ পল্লিতে বেচে দেয়। অবশ্য কিছু কিছু দেহপসারিণী কৌশলে চোরাচালানের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে।[৩৬]

পদ্মা উপখ্যান উপন্যাস হতে জানা যায় কখনো কখনো বিয়ের ফাঁদে ফেলে ওপারে নিয়ে গিয়ে নারীকে বিক্রি করে দেওয়া হয়। নারী প্রধানত চোরাচালানের সঙ্গে জড়িত থাকলেও প্রকৃতপক্ষে তারা মহাজনের 'রক্ষিতা' হয়ে থাকে—যা মহাজনের ভাষায় 'বেশ্যার' চেয়ে ভালো। চোরাচালানের সঙ্গে জড়িত নারী অনেকটা 'ঘুড়ির' মতো—তারা হয় বাতাসে ভাসে নয় তো গোত্তা খেয়ে মাটিতে পড়ে যায়—লাটাই ধরা থাকে মহাজনের হাতে।[৩৭] *ভোরের প্রসূতি* উপন্যাসে দেখা যায় স্বামী জীবন ব্যাপারী স্ত্রী সিতারাকে ওপারে মহাজনের জিম্মায় রেখে এপারে চলে এসে মহাজনের টাকা আত্মসাৎ করে প্রকারান্তরে স্ত্রীকে বেচেই দেয়। পরে স্ত্রীর ছোটভাইকে দিয়ে খবর দেয় ছলে বলে কলা কৌশলে সে যদি মহাজনের কাছ থেকে বেশ কিছু

টাকা খসাতে পারে—তবেই তার এপারে ফেরা—নচেৎ ওপারেই চিরকাল থাকতে হবে। আর সিতারার আপন ছোটভাইও তো একজন ধান্দাবাজ পুরুষ। কাজেই সে ধান্দাবাজ পুরুষের মতোই কাজ করে—বোন সাতঘাটের পানি খাবে জেনেও তাকে উদ্ধারের বিন্দুমাত্র চেষ্টা না করে দার্শনিকের মতো কথা বলে—'আমার ভবিষ্যৎ আমার। তোর ভবিষ্যৎ তোর। কে কাকে দ্যাখে। কেউ কারো না। এই চরে সবাই একলা একলা।' পুরুষের মেরে দেওয়া টাকা ফিরে না পেয়ে মহাজন সেই পুরুষের স্ত্রীকে বউ হিসেবে ব্যবহার করে আর নতুন কোনো নারীর আগমন ঘটলে পুরাতন নারী পরিত্যক্ত হয় এবং তার শেষ ঠাঁই হয় কোনো নিষিদ্ধ পল্লিতে।[৩৮] কখনো কখনো ফেলে যাওয়া স্ত্রীর কাছে স্বামী নতুন মতলবে ফিরে আসে। মহাজনের 'রক্ষিতা' নারী ঠিকই বুঝতে পারে ইতোমধ্যে দ্বিতীয় বিয়ে করা একদা তার মানুষ তাকে এবার নিয়ে গিয়ে সত্য সত্যই নিষিদ্ধ পল্লিতে বেচে দেবে। চোরাচালানের সঙ্গে যুক্ত নারীর অনেকের স্বামী নেই। যাদের স্বামী আছে তাদের কতক জনের স্বামী 'লাফাঙ্গা—দুই নম্বর'- দুপার মিলিয়ে দুতিনটা বিয়ে করে। অনেকের স্বামী যখন তখন স্ত্রীকে নির্দয়ভাবে প্রহার করে।[৩৯] তাই সে নতুন ফাঁদে পা দেয় না এবং পরিণামে তাকে স্বামীর দেওয়া বিচ্ছেদ (তালাক) মেনে নিতে হয়।[৪০]

ভোরের প্রসূতি উপন্যাস হতে জানা যায় চোরাচালানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মহাজনের একাধিক নারী সহযোগী থাকে—যারা তার রক্ষিতাও বটে। মহাজনের কব্জায় নতুন কোনো নারী আসলে পুরনো নারীর মধ্যে ঈর্ষাবোধ জাগ্রত হয় এবং আগত নারী তা সহজেই অনুধাবন করে। কিন্তু নতুন নারীও পুরনো নিয়মে নষ্ট হওয়া ছাড়া আর কী করতে পারে:

> সিতারার এই কষ্ট জগৎ জানে না। নিজেকে সে কতবার কেঁদে কেঁদে বলেছে—এই গতর যতই সুন্দর হোক, এতো ঘরের নয়, এ যে হাটের মাল গো খোদা ! একে খাটিয়ে আমি টাকা-অলা হব। পাঁচ মহাজনকে নাচাব। কালী মার্কেটের বিহারী মহাজনকে আঙুলে নাচাব। ধমক মেরে খারাপ মাল গুঁজে দেব। শুধু তাই নয়, আরো কত কী হবে ! মুস্তাফা দারোগার মুণ্ডু আমিই ঘোরাব। শালাকে পাত্তা দেব না, বলব পা চেটে দে। আমার চোখে আছে হীরার কুচির মত বাণ! ওকে ফুঁড়ব।[৪১]

ভোরের প্রসূতির সিতারা অনুরূপ জীবন সহ্য করতে পারে না আবার ছাড়তেও পারে না বটে কিন্তু সে জীবন থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা তার অষ্টপ্রহর। সে ভাবে এমন মানুষ কি কোনোদিনই আসবে না—যে তাকে চর থেকে নদীর অপর পাড়ে পৌঁছে দেবে। আর নদীর অপর পাড়ে ডাঙ্গাল জমি পেলেই 'সমস্ত উষরতার শেষে জীবনের অবিশ্বাস্য হলেও সত্যকার পত্তনি হবে নিশ্চিত।' কিন্তু বাস্তবতা এই যে, উক্ত ধারাবাহিকতায় সোনার নারী চোরাচালানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে শেষ হয়ে যায়।[৪২]

চরে বসতি স্থাপনকারী কোনো কোনো নারী বিশেষ করে সমাজের নিচুতলার নারী যান্ত্রিক সভ্যতার অন্তসারহীন জীবনের লোভে স্বধর্মচ্যুত হয়ে পড়ে। পরবর্তীকালে সেই নারী নিজের ভুল বুঝতে পারলেও স্বধর্মে ফিরতে পারে না। *কালিন্দী* উপন্যাসের সাঁওতাল কন্যা সারী চাবুকের ঘা ও ছুরির ভয়ে কারখানার ম্যানেজারের ঘরে থাকতে বাধ্য হয়। 'শখ' মিটে যাওয়ায় ম্যানেজার মুখার্জী সারীকে তাড়িয়ে দিলে সে বাধ্য হয়েই কুলি ব্যারাকের সরকারবাবু শূলপাণি রায়ের রক্ষিতা হয়ে জীবন যাপন করে। সারীর ওপর অত্যাচারের প্রতিকার চেয়ে আইনের আশ্রয় নিলে এস.ডি.ও সাহেব তদন্ত শেষে রিপোর্ট দেয়:

> বর্বর জীবনের সঙ্গে লোভ এবং নীতিহীন উচ্ছৃঙ্খলতার সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ; এক একটা জীবনে তাহা অত্যুগ্র হইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে; এ ক্ষেত্রেও তাই হইয়াছে। বর্বর, লোভ পরবশ, উচ্ছৃঙ্খল মেয়েটির এই পরিণতি ভয়াবহরূপে দুঃখজনক হইলেও ইহা স্বাভাবিক। তাহার বর্তমান অবস্থা হইতে তাহা প্রত্যক্ষ কিন্তু সে অবস্থার কথা লেখা চলে না।[৪৩]

চরকাশেম উপন্যাসে দেখা যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আয়ার চাকরির লোভ দেখিয়ে চর অঞ্চল থেকে নারী পাচার করা হয়েছে এবং অভাবের তাড়নায় ও বেশি টাকার মোহে নারী সেই ফাঁদে পা দিয়েছে।[৪৪] চরের হিন্দু বিধবার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে থাকে। পুরুষ মরে গেলে জমিদার জমি কেড়ে নেয়—বিধবার সংসার তছনছ হয়ে যায়—বিধবা অন্যের হাত ধরে অন্যত্র চলে যায়। চরের মানুষ বুঝে বিধবার অন্যত্র চলে যাওয়া ছাড়া অন্য কোনো গতি নেই। কারণ চরের বিধবাকে কেউ খেতে দেয় না, বিধবার বিয়ে হয় না বলে মা হবার আনন্দ সে কোনো কালেই পায় না। কোনো কোনো বিধবা চরে থেকে 'গতর' খাটিয়ে জীবন ধারণে আগ্রহী হলেও শেষ পর্যন্ত রক্ষিতার জীবনই তার পরিণতি হয়ে দাঁড়ায়। সে জানে এমনিতেই তার বদনামের সীমা নেই—কাজেই রক্ষিতা হয়ে থাকলেই বা কার কী? সত্যেন সেনের *একূল ভাঙ্গে ওকূল গড়ে* উপন্যাসের ইয়াকুব মিঞার স্ত্রী (আনুর মা) আরও এককাঠি সরেস। নিজের দেহ বিক্রি প্রসঙ্গে সে সগর্বে জানায়—'আমার নিজের জিনিস আমি নিজে বিক্কিরি করব, তাতে কার কি?'[৪৫] সুশীল জানার 'বেলাভূমির গান' উপন্যাসে ধানী নৌকার বিদেশি মহাজন বা চরের তহশিলদাররাই সাধারণত বিধবাকে রক্ষিতা করে রাখে। রক্ষিতার জীবনও কখনো কখনো অসহ্য হয়ে পড়ে। ফলে কোনো কোনো রক্ষিতা আত্মহত্যা করে। বিধবার পরিণতি দেখে চরের পুরুষ ভাবে সে মরে গেলে তার বউ-ঝি এ চর ছেড়ে কোথায় কার সঙ্গে চলে যাবে কে জানে।[৪৬]

চরাঞ্চলের নারীর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা বলার মতো নয়। কারণ এখানে সামগ্রিকভাবে শিক্ষা ও চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত করুণ। উক্ত প্রেক্ষিতে লক্ষণীয় যে চরের পুরুষ কিছুটা পড়তে পারলেই তাকে বৈষয়িক কাজে লাগানো হয় এবং মেয়েকে এজন্য পড়ানো হয় না যে—'ছেলের চেয়ে ছেলের বউ বেশী লেখাপড়া শিখবে?'[৪৭] আবার অনেক পুরুষ লেখাপড়া জানা মেয়েকে বিয়েই করতে চায় না।[৪৮] অবশ্য ইদানীং শিক্ষিত ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবার প্রতিও মেয়ের পরিবারের আগ্রহ দেখা দিয়েছে।[৪৯] *চর আতরজান* উপন্যাসে উল্লেখ করা হয়েছে দারিদ্র্য না থাকলেও অশিক্ষা ও লোকলজ্জার ভয়ে মানুষ আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা থেকে দূরে থাকে। বিশেষ করে প্রসবজনিত বিষয়গুলোতে গ্রাম্য ধাই দিয়েই তারা কাজ সারে।[৫০] যখন জটিলতা দেখা দেয় তখন ইচ্ছে থাকলেও উপায় থাকে না—যোগাযোগের জটিলতার কারণে মা ও শিশু উভয়ে মারা যায়।[৫১]

উপসংহার

বাংলা উপন্যাসে প্রতিফলিত বাংলার চরাঞ্চলের নারীর জীবনের প্রতি লক্ষ করলে দেখা যায় মূলত বাল্য বিয়ের কারণেই বিয়ের ক্ষেত্রে চরাঞ্চলের মেয়ের কোনো পছন্দ অপছন্দ থাকে না। চরাঞ্চলের অধিকাংশ বিত্তশীল মুসলিম পরিবারে বহুবিয়ের কারণে ঘরকন্নার স্বাভাবিক সুখ থেকে নারী বঞ্চিত হয় এবং সচ্ছল ও সুন্দরী বিধবা ছাড়া অন্য বিধবাদের প্রতিনিয়ত যৌন নিগ্রহের শিকার হতে হয়। অন্যদিকে পারিবারিক বা সামাজিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রেও তার কোনো

গুরুত্ব নেই। চরাঞ্চলের নারীর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই বললেই চলে এবং আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা থেকেও তারা বঞ্চিত। বাংলার সমাজ বাস্তবতায় চরাঞ্চলের মানুষের আর্থিক জীবনে নারীর ব্যাপক ভূমিকা দেখা যায়। অথচ বাংলা উপন্যাসে প্রতিফলিত চরাঞ্চলের জনজীবনে সংসারের আর্থিক দায় মোচনে নারীর ভূমিকা প্রায় অনুপস্থিত। এই অনুপস্থিতির কারণ হয়ত এই যে ঔপন্যাসিকগণ চর অঞ্চলের অপেক্ষাকৃত সচ্ছল পরিবারের চালচিত্র উপস্থাপন করেছেন এবং তা করতে গিয়ে তাদের উপন্যাসে চরের খেটে খাওয়া নারীদের নিষিদ্ধ যৌন জীবন যতটা প্রাধান্য পেয়েছে অন্যান্য অনুষঙ্গ ততটাই তুলনামূলক ভাবে কম উপস্থাপিত হয়েছে। বলা বাহুল্য, যে কোনো অঞ্চলের নারীকে অন্ধকারে রেখে সেই অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। কাজেই বাংলা উপন্যাসে প্রতিফলিত চরাঞ্চলের নারীর অবস্থান বিবেচনায় নিয়ে সেই আলোকে চরাঞ্চলের নারীর সম্ভাব্য উন্নয়ন বাস্তবায়ন করা গেলে বাংলার চরাঞ্চলের মানুষ তথা বাংলার মানুষ সামষ্টিকভাবে অপেক্ষাকৃত কল্যাণময় জীবন যাপন করতে পারে।

তথ্যসূচি:

---

১ অমরেন্দ্র ঘোষ, *চরকাশেম* (কলকাতা: সারস্বত লাইব্রেরি, ১৯৮৬), পৃ. ৪০
২ কাজী মাসুম, *ঢেউ জাগে পদ্মায়* (ঢাকা: গ্রেট বেঙ্গল লাইব্রেরি, ১৯৫৮), পৃ. ৪৭
৩ রাবেয়া খাতুন, *মধুমতী* (ঢাকা : কথাবিতান, ১৯৬৩), পৃ. ৬২-৬৩
৪ অনিল বড়ুয়া, *শংখ নদীর তীরে* (ঢাকা: শিরীন পাবলিকেশন্স, ১৯৬৭), পৃ. ২০
৫ আবুল খায়ের মুসলেহ উদ্দিন, *চর আতরজান* (ঢাকা: মুক্তধারা, ১৯৮৫), পৃ. ২৫, ৩০, ৩৭ ও ৫৫
৬ তদেব, পৃ. ৭০
৭ তদেব, পৃ. ৩৪, ৪৪ ও ৬৫
৮ রাবেয়া খাতুন, *মধুমতী*, পৃ. ৬২
৯ আবু ইসহাক, *পদ্মার পলিদ্বীপ* (ঢাকা: মুক্তধারা, ১৯৮৬), পৃ. ২৯ ও ১৪৭
১০ আবুল খায়ের মুসলেহ উদ্দিন, *চর আতরজান*, পৃ. ৫১ ও ৯৫
১১ অমরেন্দ্র ঘোষ, *চরকাশেম*, পৃ. ৭ ও ১০১
১২ কাজী মাসুম, *ঢেউ জাগে পদ্মায়*, পৃ. ১১
১৩ আবু ইসহাক, *পদ্মার পলিদ্বীপ*, পৃ. ৭৮
১৪ অনিল বড়ুয়া, *শংখ নদীর তীরে*, পৃ. ২১
১৫ আবু ইসহাক, *পদ্মার পলিদ্বীপ*, পৃ. ১৪৭
১৬ মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্যরত্ন, *আনোয়ারা* (যোড়শ মুদ্রণ; ঢাকা: ওসমানিয়া বুক ডিপো, ১৯৮৮), পৃ. ২৩
১৭ আবু ইসহাক, *পদ্মার পলিদ্বীপ*, পৃ. ৭৮-৭৯, ১৪৫-৫৫ ও ২০৮
১৮ তদেব, পৃ. ২৯
১৯ আবুল খায়ের মুসলেহ উদ্দিন, *চর আতরজান*, পৃ. ১০৩-০৪
২০ অনিল বড়ুয়া, *শংখ নদীর তীরে*, পৃ. ৭৩
বর্তমানে অপমানিত নারী ঘরেও থাকতে পারে না। দেখা যাচ্ছে নারীকে ঘর থেকে তুলে নিতে ব্যর্থ হয়ে ক্ষমতাধররা আক্রান্ত নারীর বাড়িঘর পুড়িয়ে দেয়— ফলে সংবাদপত্রের শিরোনাম হয়— 'কিশোরীর পরিবার বাড়ি ছাড়া', *দৈনিক প্রথম আলো*, ১লা ফেব্রুয়ারি ২০১৬, পৃ. ৮
২১ আবদুর রশীদ ওয়াসেকপুরী, *বান* (ইস্ট বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৯৫৮), পৃ. ১৬৬
২২ আবু ইসহাক, *পদ্মার পলিদ্বীপ*, পৃ. ১৮৫ ও ২০০-০৬

২৩ আবুল খায়ের মুসলেহ্ উদ্দিন, *চরআতরজান*, পৃ. ৬
অপহরণকারী অনেক সময় কাঙ্ক্ষিত নারীকে অপহরণ করে নৌকায় তুলে নদীতে নদীতে দিনের পর দিন ঘুরে বেড়ায়। সরদার আব্দুর রাজ্জাক, *ঢেউয়ের নদী ক্লান্ত পথ* (ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৭২), পৃ. ১১
২৪ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, *উপনিবেশ (*১ম পর্ব), নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী, ১ম খণ্ড (কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি. ১৯৮৮) পৃ. ২২৯-৩০, ২৫৩ ও ২৭০-৭১
২৫ কাজী মাসুম, *ঢেউ জাগে পদ্মায়*, পৃ. ২০-২৬ ও ৪৮
২৬ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, *উপনিবেশ (*১ম পর্ব), পৃ. ২৪ ও ২৬৬-৬৭
২৭ কাজী মাসুম, *ঢেউ জাগে পদ্মায়*, পৃ. ৪৮-৪৯
২৮ তদেব, পৃ. ১১
২৯ আবু ইসহাক, *পদ্মার পলিদ্বীপ*, পৃ. ৮১-৮৮, ১৭৮, ১৮৪-৯৫, ২০২-০৫, ২৯৬-৩০২ ও ৩২৪
৩০ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, *উপনিবেশ*, *১ম পর্ব*, পৃ. ২২১-২২ ও ২৩৪
৩১ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, *উপনিবেশ* (৩য় পর্ব), নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী, ৩য় খণ্ড (কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা.লি., ১৯৮২) পৃ. ১৬৩-৬৫
৩২ আবু ইসহাক, *পদ্মার পলিদ্বীপ*, পৃ. ৩৫-৩৬, ১৪৮-৫০, ২০৬-১৬, ২১৮ ও ৩২৫-২৮
৩৩ অদ্বৈত মল্লবর্মণ, *তিতাস একটি নদীর নাম* (কলকাতা: পুথিঘর, ১৯৯৮), পৃ. ৯১, ২৬২ ও ২৬৫-৮০
৩৪ রমেশচন্দ্র সেন, *কুরপালা* (প্রথম সংস্করণ; কলকাতা: অরুণা প্রকাশনী, ১৯৮৭), পৃ. ০৮, ২৫ ও ১০২-০৫
৩৫ সিরাজুল ইসলাম মুনির, *পদ্মা উপাখ্যান* (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৩), পৃ. ৩০
৩৬ আবুল বাশার, *ভোরের প্রসূতি* (কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., ১৯৯৪), পৃ. ২৩
৩৭ সিরাজুল ইসলাম মুনির, *পদ্মা উপাখ্যান*, পৃ. ৩১
ভারতে পাচার হওয়ার দেড় বছর পর দেশে ফিরলো এক নারী। *দৈনিক সোনার দেশ*, ৪ঠা ফেব্রুয়ারি ২০১৬, পৃ. ৩
৩৮ আবুল বাশার, *ভোরের প্রসূতি*, পৃ. ২৩-৫৬ ও ১৩৯
৩৯ সিরাজুল ইসলাম মুনির, *পদ্মা উপাখ্যান*, পৃ. ৩৪
৪০ আবুল বাশার, *ভোরের প্রসূতি*, পৃ. ১২৫-২৮
৪১ তদেব, পৃ. ৭৪
৪২ তদেব, পৃ. ৮৪ ও ১০৯
৪৩ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, *কালিন্দী*, তারাশঙ্কর রচনাবলী, ২য় খণ্ড (দ্বিতীয় মুদ্রণ; কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ১৯৭৫), পৃ. ৩১৪
৪৪ অমরেন্দ্র ঘোষ, *চরকাশেম*, পৃ. ১২৮
৪৫ সত্যেন সেন, *একূল ভাঙে ওকূল গড়ে* (ঢাকা: আনিছ ব্রাদার্স, প্রকাশকাল নেই), পৃ. ২২
৪৬ সুশীল জানা, *বেলাভূমির গান* (নবতন সংস্করণ; কলকাতা: বিদ্যোদয় লাইব্রেরি প্রা. লি., ১৯৬০), পৃ. ৪৭-৫৩ ও ৯০
৪৭ অবিনাশ সাহা, *প্রাণগঙ্গা* (কলকাতা: ভারতী লাইব্রেরি, ১৯৫৯), পৃ. ৭৯
৪৮ সত্যেন সেন, *একূল ভাঙে ওকূল গড়ে*, পৃ. ২০৯
৪৯ কাজী মাসুম, *ঢেউ জাগে পদ্মায়*, পৃ. ৩৪
আবুল খায়ের মুসলেহ উদ্দিন, *চর আতরজান*, পৃ. ৬১-৪৪
৫০ আবুল খায়ের মুসলেহ উদ্দিন, *চর আতরজান*, পৃ. ৬০-৬১
৫১ কাজী মাসুম, *ঢেউ জাগে পদ্মায়*, পৃ. ৫৭। ২০০৮-০৯ সালে ঠিক সময়ে হাসপাতালে নিয়ে আসতে না পারা বা চিকিৎসা দিতে না পারার জন্য (চরের) ১৩ জন প্রসূতির মৃত্যু হয়েছে। "কেদার মণ্ডলের নদী কথা' *একটি সাক্ষাৎকার*", বিতর্কিকা (বিষয়: নদী), সম্পাদনা– অভ্র ঘোষ, মিলন দত্ত ও তপস্যা ঘোষ, পৃ. ১১।